অর্থনৈতিক
উন্নয়ন বিষয়ক
সহজ ভাষার
মাসিক পত্রিকা

বর্ষ ২৭ ▪ সংখ্যা ১২ ▪ ডিসেম্বর ২০১৮

আলাপ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

আলাপ
বর্ষ ২৭। সংখ্যা ১২
ডিসেম্বর ২০১৮

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
শাহনেওয়াজ খান

উপদেষ্টা সম্পাদক
ইরাজ আহমেদ

সম্পাদনা পর্ষদ
ড. এম এহছানুর রহমান
চিন্ময় মুৎসুদ্দী
মো: আসাদুজ্জামান
রোমানা সুলতানা
মো: খায়রুল ইসলাম

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
নাজনীন জাহান খান

সম্পাদকীয়

আলাপ পত্রিকার যাত্রা শুরু হয়ে গেছে। এতোদিনে নিশ্চয়ই নভেম্বর সংখ্যা আপনাদের হাতে পৌঁছে গেছে। আপনাদের সাফল্য, আপনাদের সমস্যা, সাফল্য আর সম্ভাবনার কাহিনি দিয়েই সাজানো হলো পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা।

আলাপ একটু ভিন্ন চেহারা নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। আলাপের মূল কাজই হবে আপনাদের উন্নয়নের কাহিনি সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া। এই উন্নয়ন আর অগ্রযাত্রার কাহিনি গোটা দেশের মানুষকেও উৎসাহিত করবে বলে আশা রাখি। কারণ দেশের উন্নয়ন মানেই হচ্ছে মানুষের উন্নয়ন। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারায় অংশ নিয়ে ঢাকা আহছানিয়া মিশন দীর্ঘ সময় ধরে এই কাজটিই করে আসছে দেশজুড়ে।

আপনাদের কথা, আপনাদের কাজ হবে এই পত্রিকার পথ চলার শক্তি। আশা করি, আলাপ পত্রিকার ডিসেম্বর সংখ্যাটিও আপনাদের ভালো লাগবে। ■

সূচিপত্র

■ শাহানারা অভাব জয় করেছেন শো-পিস তৈরি করে ১ - ৩
■ মনোহরদীতে বিনামূল্যে ছানি রোগীর অপারেশন ৪
■ ভবিষ্যতে গরু অথবা খাসির মাংসের বিকল্প হয়ে উঠতে পারে টার্কির মাংস ৫-৬
■ কাজ কইরা ভালো থাকতে চাই ৭
■ আমাদের সংলাপ ৮ - ৯
■ ইতিহাস ও প্রকৃতি মিশে আছে উয়ারী-বটেশ্বরে ১০ - ১১
■ চেনা পিঁপড়ার খবর ১২
■ নকশি কাঁথায় আয়ের পথ ১২
■ ভারত ও নেপালে মাইক্রোফাইনান্স কর্মসূচী ১৩

শাহানারা অভাব জয় করেছেন শো-পিস তৈরি করে

মূল রচনা

যশোর জেলার শান্ত-সবুজ এক গ্রাম আলতাপোল। কেশবপুর উপজেলার এই গ্রামে বছর চারেক আগেও ঘরে ঘরে অভাব ছিলো। অপেক্ষাকৃত নিচু এলাকায় অবস্থিত এই গ্রাম। বর্ষাকালে ডুবে যায় মাঠঘাট। তাই ফসল ভালো হয় না। অভাব যেন জেঁকে বসেছিল আলতাপোল গ্রামে। কিন্তু এখন সেই গ্রামের মানুষ ঘুরে দাঁড়িয়েছেনন। শো-পিস তৈরি করে তারা নিজেদের ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দিয়েছেন। আর এই নীরব বিপ্লবের পেছনে আছেন গ্রামের বাসিন্দা শাহানারা বেগম ও তার পরিবার।

শাহানারা বেগমের নিজের দুই বিঘা জমি থাকলেও চাষাবাদ ভালো হতো না। সংসারে অভাব লেগেই ছিল। ২০০৫ সালে শাহানারা বেগম ভারতে এক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে যান। সেখানেই তিনি দেখেন শো-পিস তৈরির কারখানা। জানতে পারেন, এরকম একটি কারখানা তৈরি করতে খরচ লাগে ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা। তাতে ভালো লাভ হয়। দেশে ফিরে শাহানারা বেগম একটি কারখানা করার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু টাকা কোথায়? শেষে ২০০৭ সালে খুব ছোট আকারে শো-পিস তৈরির কাজ শুরু করেন তিনি। কিন্তু তার মনে ইচ্ছা বড় আকারে কারখানা বসিয়ে শো-পিসের কাজ করা। ইচ্ছাকে বাস্তবে পরিণত করতে শাহানারা ২০০৮ সালে ডিএফইডি এর দোয়েল দলে ভর্ত্তি হন। দলের সভাপতি নাছিমা বেগম তাকে সাহায্য করেন। সংস্থার মাঠ কর্মী আফরেজা বেগমের পরামর্শে টাকা জমা করতে শুরু করেন শাহানারা। পাশাপাশি মিশনের গণকেন্দ্রে পড়াশুনা করতে থাকেন। এক মাস পর ১০ হাজার টাকা ঋণ নেন তিনি। সঙ্গে নিজের এক বিঘা জমি বন্ধক দেন। জোগাড় হয় আরও ২০ হাজার টাকা। এরপর শুরু হয় তার কারখানা তৈরির কাজ। যশোর থেকে মেশিন আনা হয়। ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে শাহানারা আলতাপোল গ্রামে তৈরি করে ফেলেন শো-পিসের কারখানা। ছোট আকারে কাজ শুরু হয় তাদের।

পরের বছর সমিতি থেকে ১৫ হাজার টাকা ঋণ নেন শাহানারা। এই টাকার সঙ্গে যোগ

হয় এক বছরের লাভের ৫০ হাজার টাকা। এই টাকা দিয়ে আরো ২টি মেশিন কেনেন তিনি। এখন শাহানারা বেগমের কারখানায় ৫টি মেশিনে কাজ হয়। ডিএফইডির কাছে তার ঋণ আছে ২০ হাজার টাকা। শাহানারা বেগমের শো-পিস তৈরির কারখানায় ডাল ঘুটনী, খুনতি,হামাম দিস্তা, অ্যাসট্রে, পাউডার কেস, মশলাদান, চুরি রাখার আলনা, চামচ, ডিমসেট, আপেলসেট, টাকা রাখার ব্যাংক, ছোট পাত্র, হ্যারিকেন, খেলনা, বেলন পিড়ি, টিফিনবক্স, হাড়ি-কড়াই তৈরি হয়।

শাহানারা বেগমের এই কারখানার উন্নতি দেখে গ্রামের অন্য মানুষরাও আগ্রহী হয়ে ওঠে। তারাও শুরু করেন এ ধরণের কারখানা বসানোর কাজ। ঋণ নিয়ে কাজ শুরু হয়। এখন এই গ্রামে গেলে দেখা যাবে বাড়িতে বাড়িতে শো-পিস তৈরির কারখানা। সেখানে কাজ করছেন নারীরা। তাদের তৈরি শো-পিস চলে যাচ্ছে যশোর, সাতক্ষীরা, খুলনা, মাগুরা, নড়াইল, ফরিদপুর ও ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায়।

আলতাপোল গ্রামের অভাবী পরিবারের নারীদের সঙ্গে এখন অনেক স্বচ্ছল পরিবারের নারীরাও এই কাজ করতে এগিয়ে এসেছেন। তাদের কথা হচ্ছে, বাড়িতে অলস সময় না-কাটিয়ে কাজ করা ভালো। তাতে কিছু আয়ও হয় সংসারে।

শাহানারা বেগমের কারখানায় এখন কাজ করছেন ৫৫ জন নারী। যখন সরবরাহের চাহিদা বাড়ে তখন কর্মী সংখ্যাও বেড়ে যায়। শাহানারা জানান, কারখানায় একটি শো-পিস তৈরি করতে সময় লাগে ১০ থেকে ১৫ মিনিট। এই কাজের জন্য কর্মীরা পান ২ থেকে ১০ টাকা। প্রতি মাসে একজন নারী এই কারখানায় কাজ করে আয় করেন গড়ে ১ থেকে ২ হাজার টাকা।

শো-পিস তৈরি করতে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করা হয় আম, জাম, কাঁঠাল ও সেগুন কাঠ। শাহানারা বেগম এক ঘনফুট কাঠ কেনেন ২৩০টাকা থেকে ৩০০ টাকা দরে। প্রতিদিন কারখানায় কাঠ লাগে ৩ থেকে ৫ ঘন ফুট। আর মটরের জন্য বিদ্যুত খরচ হয় ৪০ থেকে ৫০ টাকা। কারখানায় তৈরি শো-পিস ২০ টাকা থেকে ৫০০ টাকায় বিক্রি হয়। শো-পিস বানাতে প্রচুর পরিত্যাক্ত কাঠ পাওয়া যায়। এগুলি জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

আলতাপোল গ্রামে গেলে সবার চোখে পড়বে নারীদের কাজ করার দৃশ্য। গ্রামের বাসিন্দা সিরাজুলের স্ত্রী বিউটি বেগম সঙ্গে কথা হলো। তিনিও ডিএফইডির দোয়েল

মহিলা দলের সদস্য। তিনি বললেন, শো-পিস তৈরির কাজ না থাকলে তাদের খেয়ে পরে বাঁচাটাই কঠিন হতো।

গৃহবধু ভানু বিবি চোখে খুব কম দেখেন। স্বামী দিনমজুর । প্রতিদিন কাজ পাওয়া যায় না। শো-পিস তৈরির কাজ তাদের কাছে আর্শিবাদ হয়ে এসেছে। তার সপ্তম শ্রেণীতে পড়া মেয়ে বিদ্যালয় থেকে ফিরে এসে তার সঙ্গে কাজে যোগ দেয়। ছেলে আরিফুল ইসলাম মাসে তিন হাজার টাকা বেতনে শাহানারা বেগমের কারখানায় মেশিন চালানোর কাজ করেন। আরিফুল ইসলাম জানালেন, এ কাজ করেই তাদের সংসার চলে।

আহাদ আলীর স্ত্রী নাছিমা বেগম জানালেন, শো-পিস তৈরির কাজের উপর তাদের মতো অভাবী মানুষের র্নিভরতার কথা। তার কথা হচ্ছে, এই কাজ করেই তারা বেঁচে আছেন। প্রায় সব বাড়ির নারী সদস্যরা এই কারখানায় কাজ করেন। গ্রামের মানুষদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গ্রামের প্রায় ৫০ জন মেয়ে শিশু পড়াশুনার পাশাপাশি শো-পিস তৈরির কাজ করে। সেই টাকা দিয়ে তারা পড়াশুনার খরচ সহ নিজেদের জামাকাপড় কেনার খরচ চালায়।

শুধু অভাব জয় নয় শো-পিস তৈরির প্রক্রিয়ায় পরিত্যক্ত কাঠ জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করতে পেরেও গ্রামের গৃহবধুরা খুশি। গৃহবধু রহিমা বেগম বলছিলেন, কারখানার পরিত্যাক্ত কাঠ পেয়ে তাদের রান্না করার কষ্ট অনেক কমে গেছে।

আলতাপোল গ্রামে প্রায় সারা বছরই শো-পিস তৈরির কাজ চলে। তবে আষাঢ় মাস থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত সময়ে বৃষ্টির কারণে শো-পিসের চাহিদা একটু কম থাকে। এ-সময়ে শো-পিস তৈরি করে মজুদ করা হয়। শীত আসার আগে থেকেই গ্রাম এবং শহরের বিভিন্ন মেলায় বিক্রির পরিমাণ বেড়ে যায়। আলতাপোল গ্রামে এই কারখানায় প্রতি মৌসুমে বিভিন্ন ধরণের প্রায় এক লক্ষ শো-পিস তৈরি হয়। এই গ্রামে মানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন দেখে আশপাশের গ্রামগুলিতেও এখন ১০-১২টি কারখানা বসেছে। শুধু তেইশ মাইল গ্রামেই ১৪-১৫টি কারখানা গড়ে উঠেছে। সেখানে এখন শত শত নারী কাজ করেন।

শাহানারা বেগম জানালেন, শো-পিস তৈরির সব খরচ বাদে মাসে ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা লাভ হয়। অনেক স্বপ্ন আছে শাহানারা বেগমের। তিনি চান একদিন এই শো-পিসের ব্যবসা দিয়েই তাদের অভাবী গ্রামকে বদলে দেবেন। দেশের বিভিন্ন জায়গায় তার তৈরি শো-পিস সরবরাহ হবে।

শাহানারা মনে করেন, দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী। তাদেরকে কাজের বাইরে রেখে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই সব ধরণের কাজে নারীদের আরো বেশি অংশগ্রহণ দরকার।

মো: নাসির উদ্দিন, জোনাল ম্যানেজার, খুলনা জোন, ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)

নোটিশ বোর্ড

মনোহরদীতে বিনামূল্যে ছানি রোগীর অপারেশন

চলতি ডিসেম্বর মাসে নরসিংদীর মনোহরদী উপজেলায় বিনামূল্যে চোখের ছানি অপারেশন ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে। মনোহরদীর শুকুন্দী ইউনিয়নে আয়োজিত এই ক্যাম্পে প্রবীণ, দরিদ্র ও অসহায় ২০ জন ব্যক্তির চোখে অপারেশন করা হয়। বিনামূল্যে এই অপারেশন কার্যক্রম পরিচালনা করেন নরসিংদী আধুনিক চক্ষু হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা।

ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি) ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর অর্থায়নে এই ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়।

ডিএফইডি ও পিকেএসএফ- এর অর্থায়নে 'সমৃদ্ধি কর্মসূচী' এর স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রমের আওতায় এর আগে ৮৯ জনের চোখের ছানি অপারেশন করা হয়। পাশাপাশি ডিএফইডি- এর উদ্যোগে নরসিংদী আধুনিক চক্ষু হাসপাতাল ও নরসিংদী লায়ন্স প্রগ্রেসিভ চক্ষু হাসপাতাল এর সহায়তায়-১৪২ জনের ছানি অপারেশন করা হয়।

ভবিষ্যতে গরু অথবা খাসির মাংসের বিকল্প হয়ে উঠতে পারে টার্কির মাংস

জেনে নেই

টার্কি বন্য পাখি হলেও এখন এটি গৃহপালিত পাখি। এই পাখি বাড়িতে খামার বা শেড তৈরি করেও পালন করা যায়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে টার্কি পাখির মাংস বেশ জনপ্রিয়।

স্বল্প পুঁজি ও অল্প পরিশ্রমে পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের উৎস হতে পারে টার্কি পালন। যারা নতুন কোনো ব্যবসায়িক উদ্যোগ নিতে চাইছেন তাদের জন্য টার্কি পালন একটি আদর্শ ব্যবসা।

পাখির মাংসের মধ্যে হাঁস, মুরগী, কোয়েল অথবা তিতির পাখির চেয়েও টার্কির অবস্থান অনেক উপরে। টার্কি এখন মাংসের প্রোটিনের চাহিদা মিটিয়ে অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। টার্কির মাংসে অন্য মাংসের তুলনায় প্রোটিন বেশি কিন্তু কোলেস্টরল কম। যেখানে গরু কিংবা খাসির মাংসে কোলেস্টরল ২৩-২৪ শতাংশ সেখানে টার্কি কোলেস্টরল শূন্য।

বিদেশে টার্কি ভীষণ জনপ্রিয়। যে কোন ধরনের অনুষ্ঠান অথবা রাজকীয় খাদ্য হিসেবে টার্কির মাংস সমাদৃত। বেশি টার্কি পালন করা হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র,কানাডা,জার্মানি ও ফ্রান্সে। এই তালিকায় আছে ইতালি, নেদারল্যান্ড, যুক্তরাজ্য, পোল্যান্ডসহ অন্যান্য দেশ। টার্কির জনপ্রিয়তা বাড়ছে মালয়েশিয়া, সিংগাপুর, চীন ও ভারতেও। তবে বাংলাদেশেও এখন ব্যাক্তিগত উদ্যোগে টার্কি চাষ শুরু হয়েছে। বেকার যুবকদের মাঝে টার্কি পালনে আগ্রহ ক্রমশ বাড়ছে। শহর ও গ্রামের নারীরা দেশি মুরগীর মতো এখন টার্কি পালনের দিকে ঝুঁকছেন।

বাংলাদেশের প্রাণী বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন,

আগামী কয়েক বছরের মধ্যে টার্কি পালন ব্যাপক বিস্তার লাভ করবে।

টার্কি পালনের ক্ষেত্রে সবচাইতে বড় সুবিধা হচ্ছে একে দেশী মুরগির মতো পালন করা যায়। এই পাখিটির রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বেশি। তাই ঝুঁকিও কম। টার্কি লতা-পাতা,কলমি শাক ও কচুরী পানা খায়। এরা পাতা কপি ,লাউ প্রভৃতি খেতেও পছন্দ করে। ফলে টার্কির খাবারের জোগান দেয়াটা ব্যয়বহুল নয়। টার্কিকে সামান্য দানাদার খাবারও দিতে হয় প্রোটিন ও আমিষের ঘাটতি পূরণের জন্য।

টার্কির মাংস ভবিষ্যতে গরু অথবা খাসির মাংসের বিকল্প হয়ে উঠতে পারে বলে অনেকে মনে করছেন। টার্কির মাংসে অধিক পরিমান জিংক, আয়রন, পটাশিয়াম, বি-৬ ও ফসফরাস থাকে। এ উপাদান গুলো মানুষের শরীরের জন্য উপকারী। নিয়মিত এ-মাংস খেলে কোলেষ্টরল কমে যায়। টার্কির মাংসে এমাইনো এসিড ও ট্রিপটোফেন বেশি থাকায় তা শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। ডায়বেটিসের রোগীরাও টার্কির মাংশ অনায়াসে খেতে পারেন।

টার্কি মুরগি বাণিজ্যিকভাবে পালন করতে খরচ অনেক কম। প্রথমেই আসা যায় বিদ্যুত খরচের বিষয়ে।ব্রয়লার কিংবা লেয়ার মুরগির জন্য রাতে আলোর প্রয়োজন হয় খামারে। অথচ টার্কি রাতে খাদ্য গ্রহণ না করে ঘুমায়। ফলে আলো জ্বালানোর প্রয়োজন হয় না। ব্রয়লার মুরগি গরম সহ্য করতে পারে না।

ফলে ফ্যান চালিয়ে বাতাসের ব্যবস্থা করতে হয়। কিন্তু টার্কির জন্য অতিরিক্ত গরম না হলে ফ্যানের বাতাস প্রয়োজন হয় না।আর এতে করে বিদ্যুৎ খরচ কমে যায় প্রায় ৯০ শতাংশ।

একটি টার্কি মুরগি বছরে গড়ে ডিম দেয় ১৫০ থেকে ১৮০টা। এরা ডিম দেয়া শুরু করে ২৬ থেকে ২৮ সপ্তাহ বয়স থেকে। এ-সময় একটি টার্কির ওজন হয় ৮ থেকে ১০ কেজি।

শীতকালে টার্কির যাতে ঠাণ্ডা না লাগে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। টার্কির খামারে এসময় চারদিক পর্দা, ত্রিপল অথবা প্লাস্টিকের পর্দা দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। তবে বাতাস চলাচলের জন্য ঘর বা শেডের উপরের অংশে এক ফুট বা সামান্য ফাঁকা রাখতে হবে। না-হলে বন্ধ ঘরে এমোনিয়া গ্যাস তৈরি হয়ে টার্কি অসুস্থ হয়ে পড়ে।

মো: খায়রুল ইসলাম, জোনাল ম্যানেজার, ঢাকা জোন, ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)

আমরা নারীরা

কাজ কইরা ভালো থাকতে চাই

- জাহানারা বেগম

'এক সময় আমাগো দুই বেলা ভাতের জোগাড় আছিলো না। আট ছেলেমেয়ে নিয়া আমার সংসার। পরিবারে উপার্জন করে খালি আমার স্বামী। এতোগুলা মানুষের খাওয়া জোগাড় করতেই কষ্ট হইতো।' কথাগুলো বলছিলেন নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলার দড়ি হাওলা পাড়ার বাসিন্দা জাহানারা বেগম। ২০১৫ সালের আগেও পরিবারের সদস্যদের নিয়ে অভাবের মধ্যে দিন কাটতো তার। তখন তার স্বামী খুরশেদ মিয়াও প্রতিদিন কাজ পেতো না। কাজ খুঁজে পেতে বহু জায়গায় চেষ্টা করেছেন জাহানারা বেগম। কিন্তু অনেক সময় সমাজের বাধার কারণেও কাজ পাননি তিনি।

জাহানারা বেগম ২০১৫ সালে ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)-এর পলাশ শাখায় সদস্য হন। তিনি বলছিলেন, 'আর্থিক সমস্যা থাকায় প্রথমে আমি ডিএফইডি-এর পলাশ শাখা থেকে ২০ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করি। এই ঋণের টাকা দিয়ে তিনটি ছাগল আর দশটা হাঁস কিনি। এই পশু পালন আমারে বাঁইচা থাকার নতুন পথ দেখায়।'

কিন্তু শুধু হাঁস আর ছাগল কিনেই থেমে যাননি জাহানারা বেগম। হাঁস আর ছাগল পালনের মাধ্যমে জীবনের চাকা ভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে দেন তিনি। হাঁস আর ছাগল পালন করে তার সামান্য পুঁজি তৈরি হয়। এই লাভের মুখ দেখতে দেখতে জাহানারা আবার নতুন পথে হাঁটতে শুরু করেন। তিনি ডিএফইডি'র কাছ থেকে আরো ৮০ হাজার টাকা ঋণ নেন। এই টাকা দিয়ে কিনে ফেলেন চারটি গাভী। গাভীর দুধ বিক্রির টাকা তার সংসারে সুদিন ফিরিয়ে আনে। জাহানারা এখন আর্থিক ভাবে ভালো অবস্থায় আছেন। জাহানারা বলেন, 'কাজ কইরা আমি আরো ভালো থাকতে চাই।'

পিনাক চন্দ্র কর, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, পলাশশাখা, ডিএফইডি

আমাদের সংলাপ

মিসেস রোজিনা বেগম
সদস্য নং - ১১ জবা দল,
স্বামী - মোঃ তারেক হাসান,
সররাবাদ, নারায়নপুর, বেলাব, নরসিংদী

প্রশ্নঃ- ইসলামিক মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রাম কি? সাধারন মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রাম থেকে এর পার্থক্য কি ?

উত্তর ঃ- ইসলামিক মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রাম মুলত ইসলামি শরিয়া ভিত্তিতে পরিচালিত আর্থিক সেবা দাতা প্রোগ্রাম। এ প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনারা ইসলামি শরিয়ার ভিতরে থেকে আপনাদের বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক সেবা নিতে পারেন। সাধারন মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রাম মুলত বিনিয়গকৃত টাকা সুদ চার্য করে, কিন্তু আইএমএফ বা ইসলামিক মাইক্রোফাইন্যান্স কোন সুদ চার্য করে না। ব্যাবসায়িক লেনদেনই আইএমএফ এর মুল নীতি। যেমন, প্রত্যক্ষ এবং পরক্ষ ভাবে লেনদেন হবে এবং তা হতে হবে অবশ্যই দৃশ্যমান, এটি অনুমান বা অনিশ্চয়তা নির্ভর নয়। যে দ্রব্য বিক্রয় হবে তা উভয় পক্ষের নিকট সুস্পষ্ট থাকবে এবং সামাজিক ভাবে গ্রহনযোগ্য কর্মকান্ড হতে হবে, কোন অবস্থ্যাতেই অসামাজিক, নৈতিক ভাবে ক্ষতিকর এমন দ্রব্য হতে পারবেনা। ইসলামিক মাইক্রোফাইন্যান্স মুলত পাচটি প্রকল্পের আওতায় ফাইন্যান্সিং বা বিনিয়োগ করে থাকে, যেমন ১. মুরাবাহা (কেনা বেচা), ২. বায় মোয়াজ্জাল (ধারে বিক্রয়), ৩. ইজারা (লিজ), ৪. সালাম (কৃষি বিনিয়োগ), ৫. ইসতিন্না (উদ্দোগে বিনিয়োগ)।

উত্তর দাতা: একে এম সফিকুল করিম, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, নারায়নপুর শাখা, বেলাব, ডিএফইডি

নাজমা বেগম
সদস্য নং - ০১, দলের নাম জননী/০১
স্বামী - মোঃ আশরাফ আলী
ইব্রাহীমপুর, রায়পুরা, নরসিংদী

প্রশ্নঃ- ইসলামিক মাইক্রোফাইন্যান্সে সঞ্চয়ের সুবিধা কি? এর কি কি প্রোডাক্ট আছে ?

উত্তরঃ- ইসলামিক মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রামে আপনি সাপ্তাহিক, মাসিক ভাবে সঞ্চয় জমা করতে পারেন। এছাড়াও আপনি আইএমএফএর বিভিন্ন প্রোডাক্টে যেমন, সাধারন সঞ্চয়, শিক্ষা সঞ্চয়, হজ্ব সঞ্চয়, চিকিৎসা সঞ্চয়, উৎসব সঞ্চয় ইত্যাদি, এছাড়াও বিভিন্ন প্রকার সঞ্চয়ের প্রোডাক্টে সঞ্চয় রাখা যাবে। এসমস্ত সঞ্চয়ের লাভ ইসলামি শরিয়া বোর্ডের মাধ্যমে নির্ধারিত হারে সদস্যদের দেওয়া হবে।

উত্তর দাতা: মোঃ তৌহিদুল ইসলাম, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, হাসনাবাদ শাখা, নরসিংদী

আমাদের দেশে

ইতিহাস ও প্রকৃতি মিশে আছে উয়ারী-বটেশ্বরে

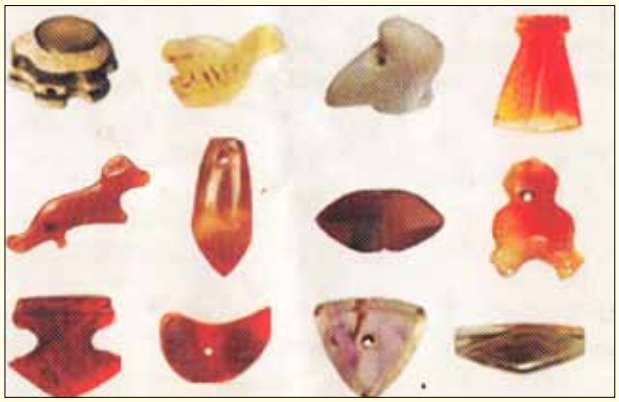

বিশেষজ্ঞদের ধারণা উয়ারী-বটেশ্বর প্রায় আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন একটি দূর্গ-নগরী। ঢাকা থেকে ৭০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলায় এটি অবস্থিত। উয়ারী এবং বটেশ্বর নামে পাশাপাশি এই দুটি গ্রাম নিয়ে এই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। কেউ কেউ বলেন, আরো প্রাচীনকালে এই জায়গায় মানুষের বসতি ছিলো। ছিলো নৌ-বন্দর।

গবেষকরা মনে করেন উয়ারী-বটেশ্বর ছিলো একটি সমৃদ্ধ ও পরিকল্পিত প্রাচীন গঞ্জ বা বাণিজ্যকেন্দ্র। ১৯৩৩ সালের ডিসেম্বর মাসে উয়ারী গ্রামে শ্রমিকরা মাটি কাটার সময় একটি কলসিতে প্রাচীন দিনের মুদ্রা আবিষ্কার করে। তখন সেই এলাকার একটি স্কুলের শিক্ষক মোহাম্মদ হানিফ পাঠান সেই কলসি থেকে ২০-৩০টি মুদ্রা বা টাকা সংগ্রহ করেন। গবেষকরা বলেন, এগুলো ছিলো তখনকার ভারতবর্ষে সবচাইতে পুরানো রূপার টাকা।

২০০০ সাল থেকে এখানে সেই প্রাচীন স্থানের চিহ্ন খুঁজে বের করার কাজ চলছে। বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে এই অঞ্চলে গবেষণা কাজের জন্য টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সুফি মোস্তাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে খনন হচ্ছে।

উয়ারী-বটেশ্বর অঞ্চলের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ব্রহ্মপুত্র নদ। গবেষকরা বলছেন, এই নদের উপর দিয়ে বঙ্গোপসাগর হয়ে সুদূর রোমান সাম্রাজ্য পর্যন্ত ব্যবসা-বাণিজ্য চলতো। খননের পর দেখা গেছে এই এলাকায় সেই প্রাচীন সময়েই চওড়া রাস্তা ছিলো। এ ধরণের রাস্তাই প্রমাণ করে তখনকার দিনে এই এলাকা খুব উন্নত ছিলো।

উয়ারী-বটেশ্বরে মাটি খুড়ে পাওয়া গেছে পুরনো দিনের মানুষের ব্যবহারের বিভিন্ন জিনিসপত্র। তার মধ্যে রয়েছে বল্লম, তীরধনুক ও কুড়ালের মতো অস্ত্র। এ-সব

মোঃ আবুল কালাম, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, বেলাব শাখা-নরসিংদী-২

অস্ত্র প্রমাণ করে সেই সময়ে দূর্গের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলো। অনেক গবেষক মনে করেন মহাবীর আলেকজান্ডারের বইতেও এরকম একটি জায়গার বিবরণ আছে। উয়ারী বটেশ্বরে মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে লোহার জিনিসপত্র। এ থেকে বোঝা যায় সেই প্রাচীন আমলের মানুষ এখানে লোহা ব্যবহার করতো। উয়ারী বটেশ্বর থেকে রৌপ্যমুদ্রা, কালো মৃসণ মাটির পাত্র, কাচের পুঁতি, পোড়ামাটি ও পাথরের শিল্পবস্তু. বাটখারা ইত্যাদিও আবিস্কৃত হয়েছে।

দূর-দুরান্ত থেকে ছাত্র-ছাত্রী আর ভ্রমণপিপাসু মানুষ আসে এই নৈসর্গিক ঐতিহ্য দেখতে। সম্প্রতি দূর্গ-নগরকে কেন্দ্র গড়ে উঠেছে নানা ধরণের দোকানপাট। একটি ঐতিহাসিক জায়গাকে ঘিরে স্থানীয় মানুষের জীবনে এসেছে পরিবর্তন। লেগেছে উন্নয়নের ছোঁয়া।

এই ঐতিহ্য সংরক্ষনের অন্যতম ব্যক্তি জনাব হাবিবুল্লা পাঠান। তার সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা অব্যাহত থাকলে উয়ারী-বটেশ্বর হতে পারে বাংলাদেশের সর্ব বৃহৎ প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যটন এলাকা। তিনি নিজ উদ্যোগে নিজের বাড়িতেই গড়ে তুলেছেন ছোট প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর। সংগ্রহ করেছেন অতীত ঐতিহ্যের নানা উপকরণ ও ব্যবহার্য সামগ্রী। সেখানে তিনি গড়ে তুলেছেন উন্মুক্ত পাঠাগার। সেই পাঠাগারে রয়েছে প্রায় দেড় হাজারের মতো দূর্লভ বই ও পত্রিকা।

উয়ারী-বটেশ্বরে যেতে চাইলে প্রধান বাহন বাস। ঢাকার মহাখালী, সায়েদাবাদ অথবা আবদুল্লাহপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে ভৈরব অথবা সিলেটগামী বাসে করে বারৈচা বাসস্ট্যান্ডে নামতে হবে। সেখান থেকে সিএনজি বা অটোবাইকে বেলাব বাজার। বাজার থেকে আবার অটোবাইকে, সিএনজিতে সোজা উয়ারী-বটেশ্বরে। সেখান থেকে আনুমানিক ৩/৪ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে রয়েছে ডাকবাংলো। ডাকবাংলোর ঠিক পশ্চিমেই গড়ে উঠেছিলো উয়ারী-বটেশ্বর দূর্গ-নগর। দূর্গ-নগরীর দক্ষিণ-পূর্বে দেড় কিলোমিটার দূরে রয়েছে বটেশ্বর পাঠান বাড়ি। আর এই বাড়িতেই রয়েছে মিনি জাদুঘর।

আশ্চর্য পৃথিবী

চেনা পিঁপড়ার খবর

পিঁপড়া আমাদের চেনা ছোট্ট এক প্রাণী। ভালো করে খেয়াল না করলে পিঁপড়ার চলাচল দেখা যায় না। কিন্তু চিনি অথবা মিষ্টির রস থাকলে পিঁপড়া এসে হাজির হবেই। এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে ২২,০০০ পিঁপড়ার প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গেছে।

পিঁপড়ার কান নেই। কিন্তু তাদের হাঁটুতে এক ধরণের অঙ্গ আছে যার মাধ্যমে পিঁপড়া সব টের পায়। মজার ব্যাপার হচ্ছে, পৃথিবীর সব পোকামাকড়দের মধ্যে সবচাইতে বড় মাথা পিঁপড়ার। তাদের পাকস্থলীর সংখ্যাও দুটি।

প্রাণীবিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, পৃথিবীর যে কোনো জায়গাতেই পিঁপড়া সহজে তাদের ঘরবাড়ি তৈরি করতে পরে। সে হিসাবে সারা পৃথিবীতে পিঁপড়া দেখা যায়। তবে পিঁপড়া নেই শুধু এন্টার্কটিকা নামে দেশটিতে। পিঁপড়া খুব দ্রুত নিজেদের খাবার জোগাড় করতে পারে। দলবেঁধে বিপদে নিজেদের রক্ষা করতেও জানে তারা। এই পিঁপড়াদের একটি প্রজাতির শরীরে এক ধরণের অ্যাসিড তৈরি হয়। প্রয়োজনে শত্রুর দিকে তারা অ্যাসিড ছুঁড়ে মারে।

বন্যার সময় পিঁপড়া বেঁচে থাকে। তারা তখন বিশেষ এক প্রক্রিয়ায় শ্বাস নেয়। গবেষণায় দেখা গেছে পিঁপড়া অনেকক্ষণ শ্বাস বন্ধ করে রাখতে পারে।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

আমাদের কাজ

নকশিকাঁথায় আয়ের পথ

নকশিকাঁথা তৈরি করতে খুব বেশি উপকরণ বা বড় পুঁজির দরকার হয় না। বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্য এই নকশি কাঁথা। নকশিকাঁথা বানাতে প্রথমেই প্রয়োজন হয় থান কাপড়। সঙ্গে দরকার হয় সুঁই এবং বিভিন্ন রঙের সুতা। নকশিকাঁথা তৈরি করতে আরেকটি অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিস হলো কাঠের তৈরি ফ্রেম। এই উপকরণগুলো সংগ্রহের পর থান কাপড়ের উপর পেনসিল বা কলমের সাহায্যে নকশাঁ এঁকে নিতে হবে। এটাই হচ্ছে এই কাঁথা তৈরির ক্ষেত্রে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তারপর কাপড়টাকে ফ্রেমে আটকে নিয়ে শুরু করতে হবে সেলাইয়ের কাজ। সেলাইটা করতে হবে কাপড়ের উপর আঁকা নকশা ধরে ধরে।

নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলায় নাছিমা বেগম এই নকশিকাঁথা তৈরি করেন। নিজের হাতে তৈরি এই কাঁথা তিনি নিজেই একটি দোকান দিয়ে বিক্রি করেন। নাছিমার একটি নকশিকাঁথার দাম ২০০০ টাকা থেকে ৩০০০ টাকা। এই নকশিকাঁথা বিক্রির টাকায় নাছিমা তার স্বামী আলমগীর মিয়াকে একটি অটো কিনে দিয়েছেন। আলমগীর অটো চালিয়ে এখন উপার্জন করছেন। নাছিমা ডিএফইডি'র কাছ থেকে ২৫০০০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে বাণিজ্যিক ভাবে এই নকশিকাঁথা তৈরী করে আয়ের নতুন পথ খুঁজে নিয়েছেন।

মোহাম্মদ তোহিদুল ইসলাম, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার,
হাসনাবাদ শাখা, নরসিংদী, ডিএফইডি

ভারত ও নেপালে মাইক্রোফাইনান্স কর্মসূচী

নেপাল বাংলাদেশের প্রতিবেশী দেশ। আয়তনের দিক দিয়ে নেপাল আমাদের চাইতে বেশ বড়। কিন্তু সে-দেশের জনসংখ্যা মাত্র দুই কোটির কাছাকাছি। নেপালের সাধারণ মানুষের একটি বড় অংশ দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে। নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডু। সেখানকার মানুষ এই মাইক্রোফাইনান্স সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানে না। সেখানে এ ধরনের প্রকল্পও কম। তবে দেশটির পাহাড়ী এলাকায় ২০ শতাংশ মানুষ এ ধরনের প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছে।

নেপালের পোখরা অঞ্চলের মানুষ এই ক্ষুদ্র ঋণের বিষয়ে ধারণা রাখে। সেখানে মানুষের প্রধান পেশা হচ্ছে কৃষি ও হোটেল ব্যবসা। তবে সেখানে ৪০ শতাংশ মানুষও এ ধরনের প্রকল্পের আওতায় নেই। নেপালে সদস্যদের সঞ্চয়ের বিপরীতে লাভ দেয়া হয় শতকরা ৪ শতাংশ হারে। ঋণের কিস্তি নেয়া হয় মোট ৪৪ সপ্তাহের মধ্যে। এই ঋণের সুদের হার ১২ শতাংশ। ঋণ বিমা নেয়া হয় ১০ শতাংশ হারে। এই বীমার বিপরীতে সদস্যদের লাভ দেয়া হয় ৬ শতাংশ। কিন্তু সদস্য পদ বাতিল হলে বীমার মূল টাকা ফেরত দেয়া হয়।

আমাদের আরেক প্রতিবেশী দেশ ভারত। দেশটির অর্থনৈতিক অবস্থা বাংলাদেশের চাইতে উন্নত। সে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বেশ বড় বড় মাইক্রোফাইনান্স বিষয়ক প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম চালাচ্ছে। এদের মধ্যে আছে 'ক্যাসপার মাইক্রোক্রেডিট', 'দিসা মাইক্রোফিনান্স', 'মাদোরা মাইক্রোফাইনান্স', 'বন্ধন ফিনানশিয়াল সার্ভিস' প্রভৃতি। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে দিসা মাইক্রোফাইনান্স ডিপোজিট ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করে। এই সুবিধার ক্ষেত্রে সুদ দেয়া হয় ৯ শতাংশ। ঋণের কিস্তি নেয়া হয় ৪৪ সপ্তাহে। সেখানে সুদের হার ১২ শতাংশ। বীমা সুবিধা দিতে হয় ১ শতাংশ। আদায়ের হার ৯৮ শতাংশ।

পাশাপাশি মাদোরা মাইক্রোফাইনান্সে ঋণের সুদ নেয়া হয় ১৩ শতাংশ। এই ঋণের কিস্তি দিতে হয় ৪৬ সপ্তাহে। বীমা সুবিধা ১ শতাংশ এবং আদায়ের হার ৯৯ শতাংশ।

একে,এম,সফিকুল করিম, শাখা ব্যবস্থাপক, নারায়ণপুর শাখা, বেলাব, নরসিংদী-২, ডিএফইডি

ছবিটি এঁকেছে:
মোঃ আলিফ হোসেন
দ্বিতীয় শ্রেণি, সমৃদ্ধি শিক্ষা কেন্দ্র
মায়ের নামঃ আলেয়া বেগম; দলের নামঃ রজনীগন্ধা; ডিএফইডি, মনোহরদী শাখা

আলাপ ওয়েব সাইটে দেখতে ক্লিক করুন - www.ahsaniamission.org.bd/alap-patrika/

সম্পাদক: কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বাড়ি ১৯, সড়ক ১২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৮১১৯৫২১-২২, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০, ৮১১৫৯০৯
The ALAP-Monthly Easy to Read News Letter, Edited & Published by Kazi Rafiqul Alam
Dhaka Ahsania Mission